তাহারা

হুমায়ূন আহমেদ

। সায়েন্স ফিকশন সমগ্র ।

সূচিপত্র

১. নিউরোলজির অধ্যাপক আনিসুর রহমান খান 2
২. রাতে খেতে গিয়ে 20
৩. পরের তিন সপ্তাহ 23
৪. ছেলেটা মারা গেছে 29

১. নিউরোলজির অধ্যাপক আনিসুর রহমান খান

নিউরোলজির অধ্যাপক আনিসুর রহমান খান খুবই বিরক্ত হচ্ছেন। তাঁর ইচ্ছা করছে সামনে বসে থাকা বেকুবটার গালে শক্ত করে থার দিতে। বেকুবটা বসেছে তাঁর সামনে টেবিলের অন্য প্রান্তে। এত দূর পর্যন্ত হাত যাবে না। অবশ্যি তাঁর হাতে প্লাস্টিকের লম্বা স্কেল আছে। তিনি স্কেল দিয়ে বেকুবটার মাথায় ঠাস করে বাড়ি দিয়ে বলতে পারেন—যা ভাগ।

কী কী কারণে এই কাজটা তিনি করতে পারলেন না তা দ্রুত চিন্তা করলেন।

প্রথম কারণ বেকুবটা তার ছেলেকে নিয়ে এসেছে। ছেলের সামনে বাবার গালে থাপ্পর দেয়া যায় না বা স্কেল দিয়ে মাথায় বাড়ি দেয়া যায় না। থাপ্পর বাদ। এটা টেকনিক্যালি সম্ভব না। বাকি থাকল স্কেলের বাড়ি।

দ্বিতীয় কারণ বেকুবটা পাঁচশ টাকা ভিজিট দিয়ে তাঁর কাছে এসেছে। সরকারি নিয়মে প্রাইভেট প্যাকটিশনাররা তিনশ টাকার বেশি ভিজিট নিতে পারেন না। তিনি নেন—তারপরেও রোগী কমে না। যে পাঁচশ টাকা ভিজিট দিয়ে এসেছে তার মাথায় স্কেল দিয়ে বাড়ি দেয়া যায় না।

তৃতীয় কারণ স্কেলটা প্লাস্টিকের। তিনি গতবার জার্মানি থেকে এনেছেন। স্কেলটা তিন ফুট লম্বা। ফোল্ড করা যায়। মাথায় বাড়ি দিলে স্কেল ভেঙে যেতে পারে।

অধ্যাপক আনিসুর রহমান স্কেল হাতে নিয়ে কুঁচকে ভাবছেন এই তিনটি কারণের মধ্যে কোনটা জোরালো। বৈজ্ঞানিকভাবে বলা যেতে পারে ওয়েটেজ কত?

তিনি লক্ষ করলেন বেকুবটা পকেটে হাত দিয়ে একটা কার্ড বের করে তার দিকে এগিয়ে দিচ্ছে।

স্যার এইটা আমার কার্ড। আমার নাম জালাল। কাটা কাপড়ের ব্যবসা করি। বঙ্গ বাজারে আমার একটা দোকান আছে। আমার ভাইস্তা দোকান দ্যাখে আমি সময় পাই না। দোকানের নাম জালাল গার্মেন্টস।

আনিসুর রহমান হাতের স্কেল নামিয়ে রাখলেন। টিস্যু বক্স থেকে টিস্যু পেপার নিয়ে নিজের নাক মুছে টিস্যু পেপার ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটের দিকে ছুড়ে মারলেন। বাস্কেটে পড়ল না। যখনই তিনি রোগী দেখেন এই কাজটা করেন। যখন ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটে টিস্যু পড়ে না তখন তিনি ধরে নেন এই রোগীর চিকিৎসায় কোন ফল হবে না। যদিও এরকম মনে করার কোন কারণ নেই। কুসংস্কার, খারাপ ধরনের কুসংস্কার। বিজ্ঞানের মানুষ হয়ে এই কাজে প্রশ্রয় দেয়া ঠিক না।

স্যার আমার দোকানে একবার যদি পদধূলি দেন তাহলে অত্যন্ত খুশি হব। আপনাদের মত অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিরা বঙ্গ বাজারে যান।

আপনার নাম জালাল?

জি। আমার ভাইস্তার নাম রিয়াজ। ফিল্ম আর্টিস্ট রিয়াজ যে আছে তার সাথে চেহারার কিঞ্চিৎ মিলও আছে। তবে তার গায়ের রঙ রিয়াজ ভাইয়ের চেয়েও ভাল।

আপনি আপনার ছেলেকে ডাক্তার দেখাতে এসেছেন?

জ্বি জনাব। আমার একটাই ছেলে তার নাম হারুন। ভাল নাম হারুন অর রশিদ। বাগদাদের খলিফার নামে নাম রেখেছি।

আপনি এত কথা বলছেন কেন জানতে পারি? রোগী দেখাতে এসেছেন রোগীর বিষয়ে কথা বলবেন। কী রোগ সেটা বলবেন। দুনিয়ার কথা শুরু করেছেন।

জনাব আমার গোস্তাকি হয়েছে। ক্ষমা করে দেবেন। কথা আগে আমি এত বলতাম না। কম বলতাম। স্ত্রীর মৃত্যুর পর কথা বলা বেড়ে গেছে। আগে পানও খেতাম না। স্ত্রীর মৃত্যুর পর পান খাওয়া ধরেছি—এখন সারাদিনই পান খাই। বললে বিশ্বাস করবেন না চা যখন খাই তখনো এক গালে পান থাকে।

আপনার ছেলের সমস্যা কী?

অংক সমস্যা।

অংক বুঝতে পারে না এই সমস্যা?

জ্বি না—এইটাই সে বুঝে। যে অংক দেবেন চোখের নিমিষে করবে। চোখের পাতি ফেলনের আগে অংক শেষ।

এটাতো কোন সমস্যা হতে পারে না।

খাঁটি কথা বলেছেন স্যার। এটা ভাল। তারে টেস্ট করার জন্য দূরদূরান্ত থেকে লোক আসে। একবার টেলিভিশন থেকে এসেছিল ম্যাগাজিন অনুষ্ঠানে নিয়ে যাবে। নিয়ে গিয়েছিল। ম্যাগাজিন অনুষ্ঠানটা আপনি দেখেছেন কি না জানি না। অনেকেই দেখেছে। আমি নিজে দেখতে পারি নাই। বেছে বেছে অনুষ্ঠান চলার সময় কারেন্ট ছিল না। অনুষ্ঠানের শেষে ছিল একটা পুরানো দিনের গান—আমার স্বপ্নে দেখা রাজকন্যা থাকে, সাত সাগর আর তের নদীর পারে। ঐটা শুধু দেখেছি। সাগরিকা ছবির গান। সাগরিকা ছবিটাও দেখেছি। উত্তম সুচিত্রার ছবি।

জালাল সাহেব।

জ্বি।

আপনি আপনার ছেলেকে নিয়ে চলে যান। এই ছেলেকে আমার দেখার কিছু নাই। আমি নিউরোলজির কোন সমস্যা হলে দেখি।

পাঁচশ টাকা আমি আপনার এসিসটেন্টকে ভিজিট দিয়েছি।

ভিজিটের টাকা ফেরত নিয়ে যান আমি বলে দিচ্ছি। আনিসুর রহমান বেল টিপলেন।

জালাল কাতর গলায় বলল, জনাব সমস্যাটা একটু শুনেন। আমিতো সমস্যা বলতেই পারি নাই। বিরাট বিপদে আছি।

আমার নিজের শরীর ভাল না। আজ আমি আর রোগী দেখব না।

কাল আসি? কাল অবশ্য মাল নিয়ে আমার চাঁপাইনবাবগঞ্জ যাওয়ার কথা। আমি নিজে মাল নিয়ে কখনো যাই না। ছেলে একলা থাকে। মা-মরা স্নেহ বঞ্চিত ছেলে। তার সঙ্গে থাকতে হয়। এই যে কাল যাচ্ছি ছেলেকেও সাথে নিয়ে যাচ্ছি। মালামাল নিয়ে যাওয়ার কাজের জন্যে আমার একজন কর্মচারী ছিল— ইরিস নাম। গত এপ্রিল মাসের নয় তারিখ এগারো হাজার টাকার মাল আর নগদ ছয় হাজার টাকা নিয়ে পালায়ে গেছে। থানায় জিডি এন্ট্রি করেছি।

স্টপ ইট।

জনাব কী বললেন?

বললাম স্টপ ইট। কথা বলবেন না।

জ্বি আচ্ছা। ছেলেটাকে একটু দেখবেন?

দেখছি আপনার ছেলেকে। দয়া করে কথা বলবেন না।

আজকে দেখে দিলে খুবই উপকার হয়। তাহলে আগামীকাল আসতে হয় না। পার্টিকে মোবাইলে খবর দিয়ে দিয়েছি। পার্টি যদি দেখে আমি কথা দিয়ে কথা রাখি না, তাহলে পরে সমস্যা হবে। ব্যবসার আসল পুঁজি গুডউইল।

স্টপ ইট।

জ্বি আচ্ছা!

আপনি দয়া করে বাইরে গিয়ে বসুন। আমি আপনার ছেলের সঙ্গে কথা বলছি।

আমি বাইরে চলে গেলে লাভ হবে না স্যার। আমার ছেলে বাপ ছাড়া কিছু বোঝে না। তার মা যখন জীবিত ছিল তখননা এই অবস্থা। এটা নিয়ে তার মায়ের খুবই আফসোস ছিল। তার মা হারুন হারুন বলে গলা ফাটায়ে দিচ্ছে ছেলে জবাব দেবে না। অথচ আমি একবার পাতলা গলায় হারুন ডাকলেজি বাবা বলে দৌড় দিয়ে ছুটে আসবে। লোক মুখে শুনি ছেলেরা হয় মায়ের ভক্ত। মেয়েরা হয় বাপের ভক্ত। আমার বেলায় উল্টা নিয়ম।

জালাল সাহেব!

জি।

আপনি কি বাইরে গিয়ে বসবেন? এখুনি বাইরে যাবেন। রাইট নাও। আপনি যদি তিন সেকেন্ডের ভিতর বাইরে না যান আমি দারোয়ান দিয়ে বের করে দেব।

রাগ করছেন কেন স্যার।

তিন সেকেন্ড। জাস্ট থ্রি সেকেন্ডস।

জালাল মিয়া উঠে দাঁড়ালেন। তার ছেলেও সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল। জালাল মিয়া বললেন, বাবা তুমি বসো। ডাক্তার সাহেব তোমার সঙ্গে কথা বলবেন।

ছেলে সঙ্গে সঙ্গে বসে পড়ল।

উনি যা জিজ্ঞেস করবেন জবাব দেবে। তোমার যে মাথার যন্ত্রণা হয় এইটা বলবা।

ছেলে হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ল।

বাবা আমি বাইরেই আছি কোন সমস্যা নাই।

ছেলে আবারো অতি বাধ্য ছেলের মত মাথা নাড়ল।

আনিসুর রহমান খান ছেলের দিকে তাকালেন। শান্ত ভদ্র চেহারা। চুল পরিপাটি করে আঁচড়ানো। তবে মাথায় চুল কম। এই বয়সী ছেলেদের মাথাভর্তি চুল থাকার কথা। বুদ্ধিহীন বড় বড় চোখ। চোখের দৃষ্টি টেবিলের পায়ার দিকে।

তোমার নাম কী?

হারুন অর রশিদ।

বাগদাদের খলিফা?

জ্বি না।

আমি তোমার সাথে ঠাট্টা করছি, তুমি যে বাগদাদের খলিফা না তা আমি জানি। তোমার সমস্যা কি?

জানি না।

তোমার বাবা আমার কাছে তোমাকে কেন এনেছেন?

জানি না। তোমার বাবা মাথা ব্যথার কথা বলছিলেন। মাথা ব্যথা হয়?

হুঁ

কখন?

যখন অংক করি।

আমি তো শুনলাম তুমি বিরাট অংকবিদ। অংক করলেই যদি মাথা ব্যথা হয় তাহলে কীভাবে হবে। এখন মাথা ব্যথা আছে?

না।

আচ্ছা তোমাকে একটা অংক করতে দিচ্ছিদেখি অংকটা করার পর মাথা ব্যথা হয় কি না। দুই এর সঙ্গে চার যোগ করলে কত হয়?

হারুন অর রশিদ এই প্রশ্নের সরাসরি জবাব দিল না। টেবিলের পায়া থেকে চোখ তুলে আনিসুর রহমানের দিকে তাকিয়ে ভয়ে ভয়ে বলল, ছয় হয়।

আনিসুর রহমান বললেন, এইতো পেরেছ। তুমি যে অংকবিদ এটা তোমার বাবা ঠিকই বলেছেন। কাগজ কলম ছাড়াই তো অংকটা করে ফেলেছ। এখন বল মাথা ব্যথা করছে?

মাথা ব্যথা করছে না।

তোমার কোন অসুখ বিসুখ নাই। যাও বাড়িতে যাও, বাড়িতে গিয়ে ঘুমাও।

হারুন উঠে দাঁড়াল। আনিসুর রহমান বললেন, তুমি তোমার বাবাকে কম কথা বলতে বলবে। আমার ধারণা তোমার বাবার ধারাবাহিক কথা শুনে তোমার মাথা ধরে। আচ্ছা যাও বিদায়।

হারুন অর রশিদ আনিসুর রহমানকে অবাক করে দিয়ে বলল, বাবার কথা শুনে আমার মাথা ধরে না। আপনি যে সব অংক দিয়েছেন সে সব করেও মাথা ধরে না। ওরা যে সব অংক দেয় সেগুলি করার সময় মাথা ধরে।

ওরা মানে কারা?

আমি তাদেরকে চিনি না। কখনো দেখি নাই। তারা হঠাৎ মাথার ভিতর অংক দিয়ে দেয়।

তুমি বস।

হারুন বসল। আনিসুর রহমান তার দিকে ঝুঁকে এসে বললেন, পরিষ্কার করে বল কী বলতে চাচ্ছ। মাথার ভিতর অংক কীভাবে ঢুকিয়ে দেবে? নাকের ফুটা দিয়ে? কথা বলছ না কেন? কথা বলে।

হারুন অর রশিদ আবারো চেয়ারের পায়ের দিকে তাকিয়ে আছে। আনিসুর রহমান ছেলেটাকে ধমক দিতে গিয়েও দিতে পারলেন না, কারণ ছেলেটা কাঁদছে।

কাদছ কেন?

আপনি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছেন এই জন্যে কাঁদছি।

সরি। আর ঠাট্টা করব না। কোক খাবে? আমার ফ্রিজে কোকের ক্যান আছে। খাবে?

হ্যাঁ খাব।

আনিসুর রহমান খান ছেলেটির দিকে তাকিয়ে আছেন। তাঁর চোখে এখন মমতার প্রবল ছায়া। ছেলেটি অনেকক্ষণ ধরেই মানসিক চাপে ছিল এই অবস্থায় তাকে কোক খেতে বলা হয়েছে। তার অবস্থানে যে আছে সে কখনো বলবে নাখাব। সে বলেছে। তাকে কোক দেয়া হয়েছে। সে আগ্রহ নিয়ে চুমুক দিচ্ছে। তার দৃষ্টি চেয়ারের পায়ে। চোখ তুলে তাকাচ্ছে না। ছেলেটার চেহারা সুন্দর। বেশ সুন্দর। চেহারায় মায়া ভাব অত্যন্ত প্রবল।

দরজায় শব্দ হল। ছেলের বাবা মাথা বের করে বলল, স্যার আসব?

আনিসুর রহমান কঠিন গলায় বললেন, না।

জ্বি আচ্ছা স্যার। আমি বাইরে আছি। এক মিনিট যদি সময় দেন হারুনের মূল বিষয়টা বলি। সে গুছায়ে বলতে পারবে না। নার্ভাস প্রকৃতির ছেলে...

আপনি বাইরে বসুন।

জ্বি আচ্ছা স্যার। প্রয়োজন হলে ডাক দেবেন, আমি আছি। অল্প কিছুক্ষণের জন্যে শুধু রাস্তার পাশে পান সিগারেটের দোকানটায় যাব। পান শেষ হয়ে গেছে। স্যার আপনার জন্যে কি একটা পান নিয়ে আসব? আমার কাছে ময়মনসিংহের খুব ভাল জর্দা আছে, মিকচার জর্দা।

আপনি বাইরে থাকুন। Please দরজা ভিড়িয়ে দিন। অনেক কথা অল্প সময়ে বলে ফেলেছেন।

দরজা বন্ধ হল। আনিসুর রহমান ছেলেটির দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমি বলতে চাচ্ছি তোমার মাথার ভিতর কারা যেন অংক ঢুকিয়ে দেয়।

জ্বি।

আর তুমি সেই অংক করতে থাকো।

জ্বি।

অংক করা শেষ হলে তারা কি অংকের উত্তর নিতে তোমার কাছে আসে?

না।

তাহলে তারা অংকের উত্তর পায় কী করে?

তারা মাথার ভিতর থেকে নিয়ে নেয়।

অংক দেয়া নেয়া এটা কি তোমার মায়ের মৃত্যুর পর শুরু হয়েছে?

না তারো আগে। আমি যখন ক্লাস ফোরে পড়ি তখন।

প্রথম তোমাকে যে অংকটা করতে দিয়েছিল সেটা তোমার মনে আছে?

আছে।

অংকটা বলো আমি কাগজে লিখে নেই।

বলব না।

কেন?

বলতে ইচ্ছা করছে না।

ওরা যে সব অংক দেয় সে সব করতে তোমার কতক্ষণ লাগে?

কোন কোনটা খুব অল্প সময় লাগে। আবার কোন কোনটা অনেক বেশি সময় লাগে। শেষ হয় না চলতেই থাকে।

এখন কি কোন অংক করছ?

হুঁ। এই অংকটা শেষ হচ্ছে না। সহজ অংক কিন্তু শেষ হচ্ছে না।

এই অংকটা কি আমাকে বলবে?

এটা হল একটা ভাগ অংক, বাইশকে সাত দিয়ে ভাগ।

এটাতো খুবই সহজ অংক। দাঁড়াও আমি দেখি আনিসুর রহমান কাগজ কলম নিলেন। হাসিমুখে বললেন এইতো হয়েছে—৩.১৪২।

হারুন বলল, শেষ করুন। শেষ হবে না চলতেই থাকবে।

আনিসুর রহমান বললেন, শেষ হবে না মানে কী? শেষ হতেই হবে। এক সময় পৌনঃপুনিক চলে আসবে। পৌনঃপুনিক কী জানো?

জানি।

স্কুলে শিখিয়েছে?

না ওরা শিখিয়েছে।

ওরা মানে কারা?

আমি জানি না।

একজন না অনেকজন?

অনেকজন। এদের মধ্যে একটা মেয়ে আছে।

মেয়ে আছে বুঝলে কী করে তার চেহারা দেখেছ?

না। গলার স্বর শুনেছি।

গলার স্বর কেমন?

খুব মিষ্টি কিন্তু ভাঙা ভাঙা।

তারা কি তোমাকে শুধু অংকই দেয় নাকি গল্প গুজবও করে?

মেয়েটা মাঝে মাঝে গল্প করে।

কী বলে?

বলে যে ওরা যে শুধু আমাকে দিয়েই অংক করায় তা-না, অনেককে দিয়েই করায়।

তুমি কখনো জিজ্ঞেস করোনি আপনারা কে?

জিজ্ঞেস করেছি। তারা উত্তর দেয় না শুধু হাসে।

আনিসুর রহমান ঘড়ির দিকে তাকালেন। রাত দশটা বাজে। নিজের উপর এখন তাঁর সামান্য বিরক্তি লাগছে। তিনি ছেলেটিকে দীর্ঘ সময় দিয়েছেন। যার কোন প্রয়োজন ছিল না। এরা ছিল শেষ রোগী, এই জন্যেই সময়টা দেয়া গেছে। তাছাড়া আগামীকাল শুক্রবার। তাঁর চেম্বার বন্ধ। ছেলেটা সুস্থ এবং স্বাভাবিক। সামান্য কিছু মানসিক সমস্যা হয়ত আছে। সেই সমস্যার সমাধান সাইকিয়াট্রিস্টরা করবেন। তিনি সাইকিয়াট্রিস্ট না। এই বিষয়টাই ছেলের বাবাকে বুঝিয়ে বলে দিতে হবে। তবে ঐ উজবুকটার সঙ্গে কথা না বলতে পারলে ভাল হত। তার সঙ্গে কথা বলার অর্থ একটা উপন্যাসের অর্ধেকটা শুনে ফেলা।

আনিসুর রহমান বাসায় ফিরলেন রাত এগারোটায়। আধাঘণ্টা দেরিতে। তাঁর রুটিন হল সাড়ে দশটার ভেতর বাসায় ফেরা। বড় একটা টাওয়েল জড়িয়ে খালি গায়ে রকিং চেয়ারে খানিকক্ষণ বিশ্রাম। বিশ্রাম করতে করতেই খবরের কাগজ পড়া। সবাই খবরের কাগজ পড়ে ভোরে, তিনি এই সময়ে পড়েন। তাঁর বক্তব্য কিছু কিছু খাবার আছে টাটকা খেতে ভাল না একটু বাসি হলে ভাল। লাগে। বাংলাদেশের খবরও সেই পর্যায়ের। বাসি ভাল, টাটকা ভাল না। খবরের কাগজ পড়তে পড়তে তিনি ঘরে ব্রিউ করা এক মগ কালো কফি খান। তাঁর একমাত্র কন্যা জেনিফারের সঙ্গে গল্প করেন। স্ত্রী রুমানার সঙ্গে কথা বলেন। ঠিক এগারোটায় বাথরুমে ঢুকে যান। বাকি আধঘণ্টা কাটে বাথরুমের বাথটাবে। বাথটাব ভর্তি থাকে পানি। তিনি গলা পর্যন্ত ডুবিয়ে পানিতে শুয়ে থাকেন। মগ ভর্তি কফি তখননা শেষ হয় না। তিনি কফিতে চুমুক দেন। বাথরুমের দরজা থাকে খোলা। জেনিফার যাতে

বাথরুমে আসা যাওয়া করতে পারে তার জন্যেই এই ব্যবস্থা। জেনিফার স্কলাসটিকায় ফিফথ গ্রেডে পড়ে। সে বাবার অসম্ভব ভক্ত। বাবা যতক্ষণ বাসায় থাকেন ততক্ষণই কিছু সময় পর পর তার বাবার সঙ্গে কথা বলা চাই।

তিনি আজ দেরি করে ফিরলেন কিন্তু সময়মতই বাথরুমে ঢুকে গেলেন। মাঝখানের আধঘণ্টার কার্যক্রম বাতিল হয়ে গেল। জেনিফার তাকে কফির মগ দিয়ে গেল। মিষ্টি করে বলল, খবরের কাগজ দেব বাবা?

আনিসুর রহমান বললেন, না।

তুমি কি আজ রাতে আমার সঙ্গে মুভি দেখবে?

দেখতে পারি। কাল ছুটি, কাজেই রাত জাগা যেতে পারে। ভাল কোন মুভি আনিয়ে রেখেছিস?

এমেডিউস দেখবে? বিষয়বস্তু কী?

মোজার্টের লাইফ।

এইসব হাইফাই জিনিস ভাল লাগবে না। ভূত প্রেতের ছবি আছে না?

অনেকগুলি আছে কোনটা দেখবে?

যেটা সবচে ভয়ংকর সেটা, ভাল কথা মা তোর ক্যালকুলেটার আছে না?

আছে।

একটা কাজ করতে চট করে ২২কে ৭ দিয়ে ভাগ করে রেজাল্টটা নিয়ে আয়।

কেন?

এম্নি।

আনিসুর রহমান গায়ে সাবান উলতে লাগলেন। আজকের কফিটা অন্যদিনের চেয়ে খেতে ভাল লাগছে। এটা চিন্তার বিষয়। তিনি দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতায় দেখেছেন যে রাতে কফি খেতে খুবই ভাল লাগে সে রাতের খাবারটা খেতে ভাল হয় না। তিনি দুপুরে একটা কলা এবং স্যান্ডউইচ খান। রাতের খাবারটা এই জন্যেই তার কাছে জরুরি।

জেনিফার বাথরুমে ক্যালকুলেটর নিয়ে ঢুকলো। মিষ্টি করে বলল, ভাগ করেছি। রেজাল্ট হচ্ছে ৩.১৪১৮৫৭১৪

আনিসুর রহমান বললেন, এই পর্যন্তই?

জেনিফার বলল, আমার ক্যালকুলেটরে দশমিকের পর আট ডিজিট পর্যন্ত হবে, এর বেশি হবে না।

আচ্ছা ঠিক আছে।

তুমি এটা দিয়ে কী করবে?

এম্লি—কোনই কারণ নেই। আজকের রাতের রান্না কী?

আজ রাতে তোমার খুব পছন্দের খাবার আছে। ইলিশ মাছের ডিমের ভুনা। কাতল মাছের মাথার মুড়িঘন্ট।

মাংস নেই?

মনে হয় না। মাংস রান্না করতে বলব?

দরকার নেই। তুই একটা কাজ করতে মা, এই অংকটাই কম্পিউটারে করে দেখ আরো বেশি ডিজিট পাওয়া যায় কী না।

কেন বাবা?

এম্লি মা ।No particular reason.

২. রাতে খেতে গিয়ে

রাতে খেতে গিয়ে আনিসুর রহমান খান চমকৃত হলেন। মাছ ছাড়াও দু ধরনের মাংস আছে। মুরগির ঝাল ফ্রাই, গরুর কলিজা ভুনা। একজন ডাক্তার হিসেবে কলিজা ভুনার মত হাই কোলেস্টেরল ডায়েট খাওয়া একেবারেই উচিত না; কিন্তু যাবতীয় হাই কোলেস্টেরল ডায়েট তার অতি পছন্দ।

রুমানা বললেন, তুমি জেনিফারকে দিয়ে পাই এর ভ্যালু বের করাচ্ছ কেন?

আনিসুর রহমান বললেন, বাইশকে সাত দিয়ে ভাগ দিতে বলেছি।

এটা হল পাই। পরিধি ডিভাইডেড বাই ব্যাস। পরিধি হচ্ছে $2\pi r$ আর ব্যাস হচ্ছে $2r$ ভাগ করলে থাকে π.

তুমি এতসব জাননা কীভাবে?

রুমানা বললেন, তুমি প্রায়ই ভুলে যাও যে আমি ফিজিক্স পড়েছি।

আনিসুর রহমান বললেন, এটাতো ফিজিক্স না এটা হল ম্যাথ।

রুমানা বললেন, চুপ করে খাও তো। কোনটা ফিজিক্স কোনটা ম্যাথ তা নিয়ে তোমার গবেষণা করতে হবে না।

আনিসুর রহমান বললেন, পাই বস্তুটার মান কত?

মান হল ৩.১৪।

তা হবে কেন এটা তো পয়েন্ট ওয়ান ফোরে শেষ হয় না, চলতেই থাকে।

চলতে থাকলেই সব সংখ্যা নিতে হবে? দরকারটা কী?

আনিসুর রহমান বললেন, তা ঠিক কোন দরকার নেই। পণ্ডশ্রম। একেবারেই পণ্ডশ্রম।

রুমানা বললেন, তুমি ডাক্তার মানুষ তুমি পাই নিয়ে হৈ চৈ করছ কেন?

আনিসুর রহমান বললেন, হৈ চৈ করছি কোথায়? হৈ চৈ করছি না।

রান্না কেমন হয়েছে?

অসাধারণকে দশ দিয়ে গুণ দিলে যা হয় তাই হয়েছে। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কলিজা ভুনা আজ রাতে খেলাম।

ইলিশ মাছের ডিমের চেয়েও ভাল হয়েছে?

এইতো এক সমস্যায় ফেললে শ্যাম রাখি না রাধা রাখি।

রুমানা বললেন, তুমি ডাক্তার মানুষ। ডাক্তারি নিয়ে থাকে। পাই এর মান, বাংলা সাহিত্য এই সবে যাবার দরকার নেই। শ্যাম রাখি না রাধা রাখি বলে কিছু নেই। বাক্যটা হল শ্যাম রাখি না কুল রাখি।

সরি।

সরি বলারও কিছু নেই। শুধু শুধু সরি বলছ কেন?

আনিসুর রহমান বললেন, সরি বলার জন্যে সরি।

রাতটা তার খুব ভাল কাটল। তিনজন মিলে ফ্রাইডে দ্যা থার্টিন ছবিটা দেখলেন। ছবি দেখে ভীত হবার আনন্দ পুরোপুরি উপভোগ করে রাতে ঘুমুতে গেলেন। ঘুম খুব ভাল হল না। সারাক্ষণই স্বপ্ন দেখলেন তিনি বাইশকে কখনো সাত দিয়ে ভাগ দিচ্ছেন, কখনো তিন দিয়ে ভাগ দিচ্ছেন আবার কখনো বা পাঁচ দিয়ে দিচ্ছেন। রাতে কয়েকবার তার ঘুম ভাঙল। এ রকম কখনো হয় না। তিনি ঘুমের ট্যাবলেট ছাড়াই এক ঘুমে রাত পার করার মানুষ।

৩. পরের তিন সপ্তাহ

পরের তিন সপ্তাহ আনিসুর রহমানের অতি ব্যস্ততায় কাটল। তিনি ব্যাঙ্গালোরে একটি সেমিনারে টেন্ড করতে গেলেন। ফিরে এসে রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজের এমবিবিএস ফাইন্যাল পরীক্ষার একটারনাল একজামিনার হিসেবে রাজশাহী গেলেন। রুমানার এক খালাতো বোনের হুট করে বিয়ে ঠিক হয়ে গেল। সেই বিয়ের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে চিটাগাং গেলেন। তবে এর ফাঁকে ফঁাকে পাই বিষয়ক কিছু তথ্য সংগ্রহ করলেন। যেমন

১. এই সংখ্যাটির মান এখনো নির্ণয় করা যায়নি। অতি শক্তিমান কম্পিউটারের সাহায্যে চেষ্টা করা হয়েছে। সংখ্যা দশমিকের পর চলতেই থাকে। কখনো পৌনঃপুনিক আসে না।

২. মহান গ্রিক অংকবিদ পিথাগোরাসের ধারণা পাই প্রকৃতির একটি রহস্যময় বিষয়। যিনি এই রহস্য উদ্ধার করতে পারবেন তিনি প্রকৃতির একটা বড় রহস্য উদ্ধার করতে পারবেন।

৩. আমেরিকান এষ্ট্রনমার কার্ল সেগান পাই-এর রহস্য নিয়ে একটি বই লিখেছেন। যে বইয়ের বিষয়বস্তু হচ্ছে পাই-এর মানে ঈশ্বর কিছু বলতে চাচ্ছেন। এটা তাঁর ভাষা।

তিনি এর মধ্যে হারুন অর রশিদ নামের ছেলেটির খোঁজ বের করারও চেষ্টা করলেন। সমস্যা হল ছেলেটির নাম ছাড়া তাঁর আর কিছুই মনে নেই। ছেলেটার বাবা একটা ভিজিটিং কার্ড দিয়েছিল সেই কার্ড তিনি ফিরিয়ে দিয়েছেন। কোথায় যেন তার একটা দোকান বা শো-রুম আছে বলেছিল। জায়গাটার নাম মনে করতে পারলেন না। শুধু মনে আছে সেই দোকানে ভদ্রলোকের এক আত্মীয় বসে যার চেহারা ফিল্মের কোন নায়ক বা নায়িকার চেহারার মত। এই তথ্য দিয়ে কাউকে খুঁজে বের করা নিতান্তই অসম্ভব ব্যাপার। তারপরেও

তিনি তার এ্যাসিসটেন্টকে দায়িত্ব দিয়েছেন—ঢাকার সব কটা স্কুলে সে যাবে সেখানে হারুন অর রশিদ নামে এগারো বার বছরের কোন ছেলে আছে কী না খোঁজ করবে। সেই অনুসন্ধানেও কোন ফল হচ্ছে না।

আনিসুর রহমানের জীবন যাপন পদ্ধতিতে সামান্য পরিবর্তন হয়েছে। তিনি এখন আর রাত সাড়ে দশটায় বাসায় ফেরেন না। তিনি ফেরেন রাত এগারোটায়। এই আধঘণ্টা সময় গভীর নিষ্ঠায় পাই-এর মান বের করার চেষ্টা করেন।

হলুদ মলাটের একশ পৃষ্ঠার একটা বাঁধানো খাতা তিনি কিনেছেন। খাতার পাতার অর্ধেকের বেশি লিখে ফেলেছেন। অংক এখনো চলছে। কাজটা করে তিনি আনন্দ পাচ্ছেন। দশটা বাজার পরপরই তিনি অস্থির বোধ করেন কখন অংক শুরু করবেন। খাতাটা তিনি বাড়িতে নেন না। অতি মূল্যবান বস্তুর মত চেম্বারে ড্রয়ারে তালাবন্ধ করে রাখেন। খাতা বিষয়ে বা অংক বিষয়ে তিনি কারো সঙ্গেই কোন কথা বলেন না। মাঝে মাঝে তার স্ত্রী উদ্বিগ্ন হয়ে প্রশ্ন করেন, তোমার কি কোন সমস্যা যাচ্ছে! তোমাকে সব সময় অস্থির লাগে কেন?

তিনি হড়বড় করে বলেন, কই অস্থির নাতো।

রাতে মনে হয় তোমার ভাল ঘুম হয় না। প্রায়ই শুনি তুমি বিড়বিড় করছ।

আমার ঘুমের কোন সমস্যা নেই।

একজন ডাক্তার কি দেখাবে?

খামাখা কেন ডাক্তার দেখাব।

তাহলে চল কিছুদিন বাইরে থেকে ঘুরে আসি।

চল যাই। কোথায় যেতে চাও?

মালয়েশিয়া যাবে? শুনেছি খুব সুন্দর জায়গা।

যেতে পারি।

আনিসুর রহমান পনেরো দিনের জন্যে সবাইকে নিয়ে মালয়েশিয়া গেলেন। খাতাটা সঙ্গে নিলেন না। পনেরো দিন আনন্দ করেই কাটালেন। দেশে ফিরে আবার সেই আগের রুটিন। তবে অংক করার সময় আরেকটু বাড়ালেন। এখন তিনি অংক করেন পঁয়তাল্লিশ মিনিট। বাসায় আগের মতই এগারোটায় ফেরেন। রোগী দেখেন পনেরো মিনিট কম।

ছয় মাসের ভেতর আনিসুর রহমানের খাতার সংখ্যা হল দশটা। অংক করার সময়ও বাড়ল। তিনি এখন ঘড়ি ধরে এক ঘণ্টা সময় দেন অংকের পেছনে। তাঁর বড় ভাল লাগে।

এক ডিসেম্বর মাসের কথা। জাঁকিয়ে শীত পড়েছে। কোল্ড ওয়েভ শুরু হয়েছে। নেমেছে কুয়াশা। আনিসুর রহমান চেম্বারে বসে আছেন। রাত আটটা। দুজন রোগী ছিল তাদের দেখা শেষ হয়েছে। চেম্বারে আর কেউ নেই। আনিসুর রহমান তাঁর এ্যাসিসটেন্টকে ছুটি দিয়ে দিয়েছেন। তাঁর নিজের মনে খুব আনন্দ। তিন ঘণ্টা টানা সময় পাওয়া গেছে। মন

লাগিয়ে অংক করা যাবে। তিনি নতুন একটা খাতা বের করলেন। আর তখন তার মাথার ভেতর কেউ একজন কথা বলে উঠল। মেয়ের গলা। অতি মিষ্টি গলা তবে ভাঙা ভাঙা।

আনিসুর রহমান ভাল আছেন?

কে কে কে? আমরা আপনার নিবেদন দেখে খুশি হয়েছি।

কে? আপনারা কে?

এখন থেকে আমরা আপনার সঙ্গে সঙ্গে থাকব। আপনাকে অংক করতে সাহায্য করব।

আপনারা কে?

আমরা কে সেটা জরুরি না। যে অংকটা আপনি করছেন সেটা জরুরি।

আনিসুর রহমান হতাশ গলায় বললেন, আমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে?

আজেবাজে কথা বলে সময় নষ্ট করবেন না। অংকটা করুন।

এই অংক কী কখনো শেষ হবে?

না।

যে অংক শেষ হবে না সেই অংক করে লাভ কী?

শেষ না হলেও একটা সিরিজ বের হয়ে আসবে। আমাদের প্রয়োজন সিরিজ। সিরিজও শেষ না।

সিরিজ কী?

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ একটা সিরিজ যেটা চলতে থাকে, আবার ২৪ ৬ ৮ ১০ আরেকটা সিরিজ। কোন সিরিজই শেষ হয় না।

একই অংক কি আপনারা অনেককে দিয়ে করাচ্ছেন? আমি যতদূর জানি হারুন অর রশিদও এই অংক করছে।

যেই মুহূর্তে আপনি শুরু করেছেন আমরা হারুনকে সরিয়ে দিয়েছি। তাকে অন্য কাজ দিয়েছি। তাকে সিরিজ করতে দিয়েছি।

হারুনের সঙ্গে কি যোগাযোগ করা যায়?

অবশ্যই যায় সে আমাদের সঙ্গেই আছে। একদিন আমরা আপনাকেও আমাদের মধ্যে নিয়ে নেব।

কবে?

সেটাতো এখননা বলতে পারছি না। হারুনের সঙ্গে কথা বলবেন।

হ্যাঁ। আরেকদিন কথা বলিয়ে দেব। কেমন?

আচ্ছা!

অংক করুন।

আচ্ছা।

৪. ছেলেটা মারা গেছে

হারুন অর রশিদের খোঁজ পাওয়া গেছে। তার বাবা এসে খবর দিয়ে গেছেন। ছেলেটা মারা গেছে অক্টোবরের ১১ তারিখ। মাথায় প্রবল যন্ত্রণা হয়েছিল। হাসপাতালে নিতে নিতেই সে মারা যায়। মৃত্যুর সময় তার নাক দিয়ে গলগল করে রক্ত পড়ছিল।

ছেলের বাবা কাঁদতে কাঁদতে বলল, স্যার আমি আপনার কাছে এসেছি, কারণ ছেলেটা প্রায়ই আপনার কথা বলত।

লোকটার হয়ত আরো অনেক কথা বলার ছিল। আনিসুর রহমান তাকে সুযোগ দিলেন না। মানুষের সঙ্গে কথা বলে তিনি এখন সময় নষ্ট করেন না। তিনি কাজ করে যান। কাজটা প্রয়োজন। অন্য সব কিছুই অপ্রয়োজনীয়।